তাসের দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা।

তাসের দেশ

প্রথম সংস্করণ (১১০০) ... ভাদ্র, ১৩৪০।
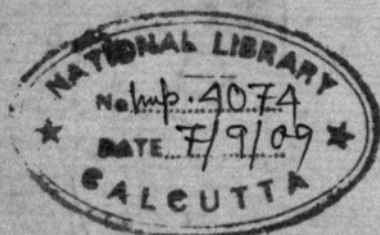
মূল্য—৸০ ও ১৲

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, বীরভূম।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

রাজপুত্র, সদাগরপুত্র।

গান

হারে রে রে রে রে
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে,
যেমন ছাড়া বনের পাখী মনের আনন্দে রে॥
ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধনহারা,
বাদলবাতাস যেমন ডাকাত, আকাশ লুটে ফেরে
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে,
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্নবাধার বক্ষ চেরে॥

রাজপুত্র

ওগো বন্ধু, আর তো চলছে না।

সদাগর

কী চাই রাজপুত্র ?

রাজপুত্র

লক্ষ্মীর পোষাপাখী, বেরিয়ে পড়তে চাই সোনার খাঁচা থেকে। নইলে ডানা গেল আড়ষ্ট হয়ে।

সদাগর

দানাপানির লোভে চুপচাপ থাকি পড়ে; বাঁধা খোরাকে মানুষ, লক্ষ্মীর পাকা আশ্রয় ছাড়তে সাহস পাইনে।

রাজপুত্র

ভীরু করেছে ঐ লক্ষ্মী। সাহস আছে লক্ষ্মী-ছাড়ার। যার বিপদ নেই তার ভরসা নেই।

সদাগর

কোথায় যাবে বন্ধু ?

রাজপুত্র

গান

যাবই আমি যাবই, ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি
অলক্ষ্মীরে পাবই।
সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন পুরীতে যাব, দিয়ে
কোন সাগরে পাড়ি।
কোন তারকা লক্ষ্য করি'
কূলকিনারা পরিহরি'
কোন দিকে যে বাইব তরী
বিরাট কালো নীরে,
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
সোনার বালুর তীরে॥

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা।
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘনবনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী।
সাতরাজাধন মাণিক পাবই
সেথায় নামি যদি॥

সদাগর

সেখানে আছে কে বন্ধু, যার জন্যে সব ছেড়ে বেরোতে চাও?

রাজপুত্র

নবীনা, নবীনা।

সদাগর

নবীনা! সে আবার কে?

রাজপুত্র

সে আছে বুড়ো দৈত্যের দুর্গে। উদ্ধার করতে হবে তাকে।

গান

হে নবীনা,
প্রতিদিনের পথের ধূলায়
যায় না চিনা॥
শুনি বাণী ভাসে
বসন্ত বাতাসে,
প্রথম জাগরণে দেখি
সোনার মেঘে লীনা॥
হে নবীনা।
স্বপনে দাও ধরা
কী কৌতুকে ভরা।

কোন অলকার ফুলে
মালা সাজাও চুলে,
কোন অজানা সুরে
বিজনে বাজাও বীণা ॥
হে নবীনা।

রাজমাতার প্রবেশ

সদাগর

রাণী মা, উনি রূপকথার দেশের সন্ধান পেতে চান।

মা

সে কী কথা! আবার ছেলেমানুষ হোতে চাস না কি?

রাজপুত্র

হাঁ মা, বুড়ো মানুষের সুবুদ্ধি-ঘেরা জগতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

মা

বুঝেছি বাছা। আর কিছু নয়, তোমার অভাব কিছু নেই, তাই তোমার মন ব্যাকুল। তুমি চাইতে চাও!

গান

তোমার মন বলে "চাই চাই গো—
যারে নাহি পাই গো।"
সকল পাওয়ার মাঝে
তোমার মনে বেদন বাজে
"নাই নাই নাই গো।"
হারিয়ে যেতে হবে
তোমায় ফিরিয়ে পাবে তবে।
সন্ধ্যাতারা যায় যে চলে
ভোরের তারায় জাগবে বলে,
বলে সে "যাই যাই যাই গো॥"

মা

বাছা, তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই হারাব। তুমি বইতে পারবে না সুখের বোঝা, সইতে পারবে না সেবার বন্ধন। আমি ভয় করে অকল্যাণ করব না। ললাটে দেব শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেত উষ্ণীষে পরাব শ্বেতকরবীর গুচ্ছ। যাই, কুলদেবতার পূজো সাজাতে। সন্ধ্যার সময় আরতির কাজল পরাব চোখে। পথে দৃষ্টির বাধা যাবে কেটে।

[রাজমাতার প্রস্থান।

রাজপুত্র

গান

হেরো সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে।
সূর্য্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে॥

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রৈব না আর কভু॥
যাবই আমি যাবই, ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই।
অকূলমাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্চি অজানায়,
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।
নব নব পবন ভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ব্ব ধন যত।
ভিখারী মন ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো॥

———

প্রথম দৃশ্য

রাজপুত্র

ওহে সদাগর, অবশেষে ভাঙা তরী তুলে দিয়ে গেল এই তীরে। আমরা ঝোড়ো হাওয়ার উপহার।

সদাগর

যম আমাদের ফিরিয়ে দিলেন উল্টো রথে।

রাজপুত্র

আমরা ঝড়ের বাণী এনেছি এই দেশে।

সদাগর

দরকার ছিল না কি ?

রাজপুত্র

ছিল বৈ কি। দেখলে না এখানকার মানুষ-গুলো বেঁচেও নেই মরেও নেই।

সদাগর

সকালবেলায় দেখলুম বটে, ওরা কী একরকম চৌকো চৌকো চালে নড়ছে চড়ছে, তাকে ঘুমও বলে না জাগাও বলে না।

রাজপুত্র

আমার ঠিক মনে হোলো কাব্যের কথা থেকে তার ছন্দটা বেরিয়ে এসেছে—অর্থের বালাই নেই, যেমন তেমন করে চলছে।

সদাগর

সবাই এরা কেমন চ্যাপ্‌টা। পেটেপিঠে এক। চলে, একটুও এগোয় না। বিধাতা এদের ভিতর-টাতে হাওয়া ভরে দিতে ভুলে গেছেন। এদের মন বলে কোনো বালাই নেই। এই মনমরা দেশকে কি নতুন দেশ বলে? এ নতুনও না, পুরোনোও না।

রাজপুত্র

হতাশ হোয়ো না বন্ধু। এটা ঢাকা-পড়া দেশ।

ঢাকা খুললেই বেরিয়ে পড়বে নতুন রূপ। এবার ভিতরকার সমুদ্রে দিতে হবে পাড়ি, সেখানে আসবে ঝড়। সেই তুফানের মুখে উঠব নতুন দেশের ডাঙায়। গাইব—

গান

এলেম নতুন দেশে—
তলায় গেল ভগ্নতরী কূলে এলেম ভেসে॥
অচিন মনের ভাষা
শোনাবে অপূর্ব্ব কোন আশা,
বোনাবে রঙীন সুতোয় দুঃখ সুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে॥
নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না জানা ফুলের মালা নিয়া
হিয়ায় দেবে হিয়া।

যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে
ফাগুন মাসে
বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে।
মাতবে দখিন বায়
মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়
চঞ্চলিত এলোকেশে॥

(রাজপুত্রের উচ্চহাস্য)

সদাগর

কী হোলো ?

রাজপুত্র

দেখো চেয়ে—কী করছে! লাল উদ্দিপরা কালো উর্দ্দিপরা দুই পক্ষ দুইদিকে সাজানো। উঠছে, পড়ছে, শুচ্চে, বসছে, এদিকে ফিরছে, ওদিকে ফিরছে, বেরিয়ে যাচ্চে, ফিরে আসছে—অত্যন্ত গম্ভীর মুখে, যেন সব কিছুর চেয়ে জরুরী। কী অদ্ভুত!—হাহাহাহা!

(একদল তাসের লোকের প্রবেশ)

ছক্কা

এ কী ব্যাপার! হাসি!

পঞ্জা

লজ্জা নেই তোমাদের, হাসি!

ছক্কা

নিয়ম মানো না তোমরা, হাসি!

রাজপুত্র

হাসির একটা অর্থ আছে। কিন্তু তোমরা যে কাণ্ডটা করছিলে তার অর্থ নেই যে।

ছক্কা

অর্থ! অর্থের কী দরকার! চাই নিয়ম। এটা বুঝতে পারো না? পাগল না কি তোমরা!

রাজপুত্র

খাঁটি পাগল তো চেনা সহজ নয়। চিনলে কী করে!

পঞ্জা

চাল চলন দেখে।

রাজপুত্র

কী রকম দেখলে ?

ছক্কা

দেখলেম কেবল চলনটাই আছে তোমাদের, চালটা নেই।

সদাগর

আর তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটা নেই।

পঞ্জা

জানো না, চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক।

ছক্কা

গুরুমশায়ের হাতে মানুষ হওনি। কেউ বুঝিয়ে দেয়নি, রাস্তায় ঘাটে খানা আছে, ডোবা

আছে, কাঁটা আছে, খোঁচা আছে, চলন জিনিষ-
টার আপদ বিস্তর।

রাজপুত্র

এ দেশে গুরুমশায়ের অভাব হবে না। শরণ
নেব তাঁদের।

ছক্কা

এবার তোমাদের পরিচয়টা।

রাজপুত্র

বিদেশী আমরা।

পঞ্জা

বাস্‌, আর বলতে হবে না। তার মানে
তোমাদের জাত নেই, কুল নেই, গোত্র নেই,
গাঁই নেই, জ্ঞাত নেই, গুষ্টি নেই, শ্রেণী নেই,
পংক্তি নেই।

রাজপুত্র

কিছু নেই কিছু নেই। সব বাদ দিয়ে যা

আছে এই যা দেখছ। এখন তোমাদের পরি-
চয়টা ?

ছক্কা

আমরা ভুবনবিখ্যাত তাসবংশীয়। আমি
ছক্কা শর্ম্মণ।

পঞ্জা

আমি পঞ্জা বর্ম্মণ।

রাজপুত্র

ঐ যারা সঙ্কোচে দূরে দাঁড়িয়ে ?

ছক্কা

কালো হানো ঐ তিরি ঘোষ, আর রাঙা
মতো ছুরি দাস।

সদাগর

তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে ?

ছক্কা

ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে।

তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন সেই পবিত্র হাই থেকে আমাদের উদ্ভব।

পঞ্জা

এই কারণে কোনো কোনো ভাষায় আমাদের তাসবংশীয় না বলে হাই-বংশীয় বলে।

সদাগর

আশ্চর্য্য !

ছক্কা

শুভ গোধূলি লগ্নে পিতামহ চার মুখে এক সঙ্গে তুললেন চার হাই।

সদাগর

বাস্‌রে ! ফল হোলো কী !

ছক্কা

বেরিয়ে পড়ল ইস্কাবন রুইতন হরতন চিঁড়েতন। এঁরা সকলেই প্রণম্য। (প্রণাম)

রাজপুত্র

সকলেই কুলীন ?

ছক্কা

কুলীন বই কী। মুখ্য কুলীন, মুখ থেকে উৎপত্তি। তাসবংশের আদি কবি শ্রীযুক্ত তাসরঙ্গনিধি দিনের চার প্রহর ঘুমিয়ে স্বপ্নের ঘোরে প্রথম ছন্দ বানালেন। সেই ছন্দের মাত্রা গুণে গুণে আমাদের সাড়ে সাঁইত্রিশ রকম পদ্ধতির উদ্ভব।

রাজপুত্র

সেটা তো শোনা চাই।

পঞ্জা

তা হোলে মুখ ফেরাও। ভাই ছক্কা, ঠুঙ্ মন্ত্র পড়ে ওদের কানে একটু ফুঁক্ দিয়ে দাও।

রাজপুত্র

কেন?

ছক্কা

নিয়ম।

(হাত জোড় করে সকলের গান)

গান

হা—আ—আ—আই।
হাতে কাজ নাই হাতে কাজ নাই॥
দিন যায় দিন যায়
আয় আয় আয় আয়
হাতে কাজ নাই॥

রাজপুত্র

আর সহ্য করতে পারছিনে। এবার মুখ ফেরাই।

পঞ্জা

ভেঙে দিলে মন্ত্রটা! আর খানিকটা পড়লেই আমরা সব্বাই ঘুমিয়ে পড়তুম।

রাজপুত্র

সেটা অনুভব করেছি। একটা কথা

জিজ্ঞাসা করি। ঐ পাড়ির উপরে কী করছিলে দল বেঁধে।

ছক্কা

যুদ্ধ।

রাজপুত্র

তাকে বলো যুদ্ধ!

পঞ্জা

নিশ্চয়! অতি বিশুদ্ধ নিয়মে—তাস-বংশোচিত আচার অনুসারে।

গান

আমরা চিত্র অতি বিচিত্র।
অতি বিশুদ্ধ অতি পবিত্র।

সদাগর

তা হোক, যুদ্ধে একটু রাগারাগি না হোলে রস থাকে না।

ছক্কা

আমাদের রাগ রঙে।

গান

আমাদের যুদ্ধ
নহে কেহ ক্রুদ্ধ ;
ঐ দেখো গোলাম
অতিশয় মোলাম।

সদাগর

তা হোক না, তবু কামান বন্দুকটা যুদ্ধক্ষেত্রে মানায় ভালো।

পঞ্জা

গান

নাহি কোনো অস্ত্র,
খাকি-রাঙা বস্ত্র।

রাজপুত্র

নাই রইল, তবু একটা নালিশ থাকা চাই। তবেই তো দুই পক্ষে লড়াই বাধে।

ছক্কা

গান

যথারীতি জানি,
সেইমতে মানি
কে তোমার শত্রু কে তোমার মিত্র॥

পঞ্জা

ওহে বিদেশী, শাস্ত্রমতে তোমাদেরও তো একটা উৎপত্তি ঘটেছিল?

সদাগর

নিশ্চিত। পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির গোড়াতেই সূর্য্যকে যেই শানে চড়িয়েছেন অমনি তাঁর নাকের মধ্যে একটা স্ফুলিঙ্গ ঢুকল। তিনি হেঁচে ফেললেন। সেই হাঁচি থেকে আমাদের উৎপত্তি।

ছক্কা

এখন বোঝা গেল, তাই এত চঞ্চল।

রাজপুত্র

স্থির থাকতে পারিনে, ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ি।

পঞ্জা

সেটা ভালো নয়।

সদাগর

কে বলবে ভালো। আদিযুগের হাঁচির তাড়া আজও সামলাতে পারছিনে।

ছক্কা

একটা ভালো ফল দেখতে পাচ্চি হাঁচির ধাক্কায় এই দ্বীপ থেকেও সকাল সকাল সরে পড়বে—টিঁকতে পারবে না।

সদাগর

টেঁকা শক্ত।

পঞ্জা

তোমাদের যুদ্ধটা কী ধরণের ?

সদাগর

সেটা ঐ চার নাকের হাঁচির মাপে।

ছক্কা

তোমাদেরও আদি কবির মন্ত্র আছে তো।

সদাগর

আছে বই কী !

গান

হাঁচ্চোঃ—
ভয় কী দেখাচ্চো।
ধরি টিপে টুঁটি,
মুখে মারি মুঠি,
বলো দেখি কী আরাম পাচ্চো !

অসবর্ণ। কী জাতি তোমরা ?

সদাগর

আমরা নাশক। নাসা থেকে উৎপন্ন।

পঞ্জা

কোনো উচ্চ জাতির অমনতরো নাম শুনিনি।

সদাগর

তোমরা হাইয়ের বাষ্পে উচ্চে গেছ উড়ে, আমরা হাঁচির চোটে পড়ে গেছি নীচে মাটির দিকে।

ছক্কা

পিতামহের নাসিকার অসংযমবশতই তোমরা এমন অদ্ভুত।

রাজপুত্র

সে কথা কবুল করি।

আমরা   নূতন যৌবনেরি দূত।
        আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত॥
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোক বনের রাঙা নেশায় রাঙি।
    ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই—
                আমরা বিদ্যুৎ॥
        আমরা করি ভুল—
    অগাধজলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
            যেখানে ডাক পড়ে
            জীবন মরণ ঝড়ে
                আমরা প্রস্তুত॥

ছক্কা পঞ্জা উভয়ে

(পরস্পর মুখ চেয়ে) এ চলবে না। এ চলবে না।

রাজপুত্র

তাকেই আমরা চালাই।

ছক্কা

কিন্তু নিয়ম!

রাজপুত্র

বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম বেরিয়ে পড়ে। নইলে এগোব কী করে?

পঞ্জা

এগোবে! কী বলে এরা! ওরে ভাই, এরা যে অম্লানমুখে বলে বসল এগোব!

রাজপুত্র

নইলে চলা কিসের জন্যে?

ছক্কা

চলা! চলবে কেন তুমি? চলবে নিয়ম।

সকলে

গান

চলো নিয়মমতে।
দূরে তাকিয়ো নাকো,
ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো,
চলো সমান পথে॥
হেরো অরণ্য ওই,—
হোথা শৃঙ্খলা কই,
পাগল ঝরণাগুলো দক্ষিণ পর্ব্বতে।
ওদিক চেয়ো না চেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না—
চলো সমান পথে॥

পঞ্জা

ঐ আসছেন রাজা সাহেব, (আসছেন রাণী-বিবি।) এইখানে আজ সভা। এই নাও ভুঁই-কুমড়োর ডাল একটা করে—বোসো ঈশান

কোণে মুখ করে—খবরদার বায়ুকোণে মুখ ফিরিয়ো না।

(রাজা, রাণী, রাজকুমারী, টেক্কা, গোলাম প্রভৃতির যথারীতি যথাভঙ্গীতে প্রবেশ)

রাজপুত্র

ওহে বন্ধু, স্তবগান করে রাজাকে খুসি করে দিই—তুমি ভূঁইকুমড়োর ডালটা দোলাও।

সদাগর

পরীক্ষা করে দেখা যাক, কী হয়।

রাজপুত্র

গান

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস।
ক্রীড়াসরসীনীরে রাজহংস।
তাম্রকূট-ঘন-ধূমবিলাসী,
তন্দ্রা-তীর নিবাসী,—

সব অবকাশধ্বংস,
যমরাজেরই অংশ ॥

(চারিদিকে রব উঠল,—"ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা, অকালে ভেঙে দিলে সভা, বর্ব্বর।)

রাজাসাহেব

শান্ত হও, শান্ত হও! এরা কারা?

ছক্কা

বিদেশী।

রাজাসাহেব

তা হোলে নিয়ম খাটবে না। একবার সকলে ঠাঁই বদল করে নাও, তা হোলেই দোষ যাবে কেটে। সর্ব্বাগ্রে তাস-মহাসভার জাতীয় সঙ্গীত।

সকলে

গান

ইস্কাবন, চিঁড়েতন হরতন।
অতি সনাতন ছন্দে কর্ত্তেছে নর্ত্তন ॥

কেউবা ওঠে কেউ পড়ে, কেউবা একটু নাহি নড়ে—
কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে করে কালকর্ত্তন ॥
নাহি কহে কথা কিছু—
একটু না হাসে,
সামনে যে আসে
চলে তার পিছু পিছু।
বাঁধা তার পুরাতন চালটা,
নাই কোনো উল্টা পাল্টা,
নাই পরিবর্ত্তন ॥

রাজাসাহেব

ওহে বিদেশী।

রাজপুত্র

কী রাজাসাহেব।

রাজা

কে তুমি!

রাজপুত্র

আমি সমুদ্র পারের দূত।

গোলাম

ভেট এনেছ কী?

রাজপুত্র

এ দেশে যা সব চেয়ে দুর্লভ তাই।

গোলাম

কী সেটা শুনি?

রাজপুত্র

উৎপাত।

ছক্কা

শুনলে তো রাজাসাহেব, কথাটা তো শুনলে? লোকটা এগোতে চায়, শুনলে বিশ্বাস করবে না! লোকটা হাসে। দু-দিনে এখানকার হাওয়া দেবে হালকা করে।

গোলাম

এখানকার হাওয়া যেমন স্থির যেমন ভারী, এমন কোনো গ্রহে নেই। ইন্দ্রের বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত এর মধ্যে দন্তস্ফুট করতে পারে না। অন্যে পরে কা কথা!

সকলে একবাক্যে

অন্যে পরে কা কথা!

গোলাম

লঘুচিত্ত বিদেশী এই হাওয়াকে যদি হালকা করে, কী হবে।

রাজা

সেটা চিন্তার বিষয়।

সকলে

চিন্তার বিষয়।

সম্পাদক

হালকা হাওয়াতেই ঝড় আসে।

দহলা

ঝড় এলেই নিয়ম যাবে উড়ে। তখন আমাদের পুরুত্‌ঠাকুর নহলা গোস্বামী পর্য্যন্ত বলতে স্নুরু করবেন আমরা এগোব।

পঞ্জা

এমন কি, ভগবান না করুন, এখানে সকলের মধ্যে হাসি সংক্রামক হয়ে উঠবে।

রাজাসাহেব

ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

ইস্কাবন

কী রাজাসাহেব?

রাজা

তুমি তো সম্পাদক?

ইস্কাবন

আজ্ঞা হাঁ, আমি তাসদ্বীপ-প্রদীপের সম্পাদক।

রাজা

এই পবিত্র তাসভূমির কৃষ্টি যে তোমারি কলমের মুখে।

সকলে

কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি, তাস-মহাদ্বীপের কৃষ্টির উনিই বাহন, আবার উনিই হলধর।

রাজা

তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

ইস্কাবন

দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।

রাজা

সেই স্তম্ভের গর্জ্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার বায়ুকে লঘু করা সইব না!

সম্পাদক

বাধ্যতামূলক আইন চাই। স্বদেশের কৃষ্টিতে বিদেশের কৃষ্টি যেন লাঙল না চালায়।

রাজা

বিদেশী, তোমার কোনো আবেদন আছে?

রাজপুত্র

আছে। কিন্তু তোমার কাছে নয়।

রাজা

কার কাছে?

রাজপুত্র

এই রাজকুমারীদের কাছে।

রাজা

আচ্ছা বলো।

রাজপুত্র

গান

ওগো শান্ত পাষাণ মূরতি সুন্দরী,
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি ॥
কুঞ্জবনে এসো একা
নয়নে অশ্রু দিক্ দেখা,
অরুণরাগে হোক রঞ্জিত
বিকশিত বেদনার মঞ্জরী ॥

রাণী

এ কী অনিয়ম, এ কী অবিচার!

পঞ্জা

রাজাসাহেব নির্ব্বাসন, ওকে নির্ব্বাসন।

রাজাসাহেব

নির্ব্বাসন! রাণীবিবি, তোমার কী মত?

চুপ করে রইলে যে ? শুনছ আমার কথা ? এব
উত্তর দাও। কী বলো ? নির্ব্বাসন তো ?

রাণী

না নির্ব্বাসন নয়।

বিবি ও টেক্কারা একে একে

না নির্ব্বাসন নয়।

সম্পাদক

টেক্কাকুমারী, বিবিসুন্দরী, মনে রেে
আমার হাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভ !

সকলে

কৃষ্টি, কৃষ্টি, তাসদ্বীপের কৃষ্টি ! বাঁচাও দে
কৃষ্টি !

সম্পাদক

জারি করো বাধ্যতামূলক আইন।

রাজাসাহেব

তোমার কী মত রাণী বিবি ? বাধ্যতামূল
আইন এবার চালাই।

রাণী

বাধ্যতামূলক আইন অন্দরমহলে আমরাও চালিয়ে থাকি। দেখব কে দেয় কাকে নির্ব্বাসন।

টেক্কাকুমারী

আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।

সম্পাদক

একী হোলো! হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি!

রাজা

সভা ভেঙে দিলুম। এখনি সবাই চলে এসো। আর এখানে থাকা নয়। বিপদ ঘটবে।

[সকলের প্রস্থান। মেয়েরা কিছুদূর গিয়ে ফিরে এল]

রাজপুত্র

গান

হে মাধবী, দ্বিধা কেন আসিবে কি ফিরিবে কি।
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি॥

বাতাসে লুকায়ে থেকে কে যে তোরে গেছে ডেকে
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে যে গেছে লেখি ॥
কখন দখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি,
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া, করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি ওঠে দূর হতে কারে দেখি ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীমতী হরতনী টেক্কা

গান

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে,
জানিনে কী ছিল মনে ॥
এ তো ফুল তোলা নয়,
বুঝিনে কী মনে হয়
জল ভরে যায় দু-নয়নে ॥

(রুইতনের সাহেবের প্রবেশ)

রুইতন

এ কী হরতনী, তুমি এখানে—খুঁজতে খুঁজতে বেলা হয়ে গেল ।

হরতনী

কেন কী হয়েছে, কী চাই ?

রুইতন

তোমাকে ডাক পড়েছে রাজসভার গরাবু-মণ্ডলে।

হরতনী

বলো গে, আমি হারিয়ে গেছি।

রুইতন

হারিয়ে গেছ!

হরতনী

হাঁ, হারিয়ে গেছি। যাকে খুঁজছ তাকে আর খুঁজে পাবে না কোনোদিন।

রুইতন

এ কী কাণ্ড! এ কী দুঃসাহস! বনে এসেছ তুমি! জানো না নিয়ম নেই!

হরতনী

নিয়ম তো নেই। কিন্তু কার নিয়মে এই বর্ষাবিহীন তাসের দেশে আজ এমন ঘনঘটা।

হঠাৎ সকালে উঠেই দেখি নীল মেঘ আকাশ জুড়ে। এতদিন তোমাদের দেশের ময়ূর গুণে গুণে পা ফেলত, নাচত সাবধানে আজ কেন এমন অনিয়মের নাচ নাচল পেখম ছড়িয়ে ?

রুইতন

কিন্তু ফুল তোলা—এমন অদ্ভুত কাজ তোমার মাথায় এল কী করে ?

হরতনী

হঠাৎ মনে হোলো আমি মালিনী, আর জন্মে ফুল তুলতেম। আজ পূবে হাওয়ায় সেই জন্মের ফুলবাগানের গন্ধ এল। সেই জন্মের মাধবীবন থেকে ভ্রমর এসেছে আমার মনের মধ্যে।

গান

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে,
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে॥
আলোতে কোন গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে॥

(চিঁড়েতনীর প্রবেশ)

চিঁড়েতনী

গান

কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুণিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে দিল সব কাজ ভুলায়ে
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে॥

রুইতন

এ কী! তুমিও যে চিঁড়েতনী! গরাবু মণ্ডলের জন্যে বিবিসুন্দরীদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, তারাও কি তবে—

চিঁড়েতনী

হাঁ, তারাও এইখানেই নদীর ধারে ধারে গাছের তলায় তলায়।

রুইতন

কী করছে?

চিঁড়েতনী

সাজ বদল করছে। আমারি মতো। কেমন দেখাচ্চে? পছন্দ হয়?

রুইতন

মনে হচ্চে পর্দ্দা খুলে গেছে,—চাঁদের থেকে মেঘ গেছে সরে। একেবারে নতুন মানুষ।

চিঁড়েতনী

তোমাদের ছক্কা পঞ্জা আমাদের শাসাবার জন্যে এসেছিলেন—তাঁদের কী দশা হয়েছে দেখো গে যাও।

রুইতন

কেন? কী হোলো?

চিঁড়েতনী

ক্ষ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে। এমন কি, গুন গুন করে গান করছে।

রুইতন

গান! বলো কী! ছক্কা পঞ্জার গান?

চিঁড়েতনী

সুরে না হোক বেসুরে। আমি তখন চুল বাঁধছিলুম—টিঁকতে পারলুম না, চলে আসতে হোলো।

রুইতন

চুল বাঁধছিলে? সে আবার কী? এ বিদ্যে কে শেখালে?

চিঁড়েতনী

কেউ না। ঐ দেখো না এবার হঠাৎ শুকনো ঝরণায় নামল বর্ষা। জলের ধারায় ধারায় সুরু হোলো বেণীবন্ধন। এ বিদ্যে কে শেখালে তাকে?

রুইতন

বড়ো গোলমাল ঠেকছে। হরতনী, তোমার ঐ সাজিটা দাও না, ফুল তুলে দিই তোমাকে!

হরতনী

আমাকে একলা থাকতে দাও।

চিঁড়েতনী

আচ্ছা রুইতন সাহেব, চলো আমার সঙ্গে, ছক্কা পঞ্জার গানটা শুনিয়ে দিই।

রুইতন

দোষ দেব কাকে? আমারই গাইতে ইচ্ছে করছে।

চিঁড়েতনী

দেখো, সম্পাদক যেন না শুনতে পায়। স্তম্ভে চড়াবে। সে দেখলুম, ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বনের খবর নিতে।

রুইতন

ভয় কিন্তু আমার গেছে ঘুচে। কেন কী জানি। একটা কিছু হুকুম করো, বলো, তোমার জন্যে কী করতে পারি।

চিঁড়েতনী

আর যাই করো, গান গেয়ো না। বনে জবা ফুটেছে, তুলে এনে দাও।

রুইতন

কিসের প্রয়োজন?

চিঁড়েতনী

ফুলের রস দিয়ে রাঙাব পায়ের তলা।

রুইতন

দেখো সুন্দরী, আজ সকালে উঠেই বুঝেছি আমাদের এ জন্মটা স্বপ্ন। সেটা হঠাৎ ভাঙল। আমাদের আর এক জন্ম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্চে। তারি কথা আসছে মুখে, তার গান শুনছি কানে।

চিঁড়েতনী

তাই বাসায় ফিরে-আসা পাখীর মতো হঠাৎ গান এল আমার গলায়। সে গান নতুন তবু পরিচিত।

রুইতন

ঐ শোনো ঐ শোনো! আমার সে যুগের আকাশে বেজে উঠেছে।

(নেপথ্যে)

গান

পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে—
মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে॥
যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূষণ পরাই কানে,
রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে॥

চিঁড়েতনী

এ গান কোনোদিন তুমি বেঁধেছিলে, আর মারি জন্যে? কেমন করে বাঁধলে?

রুইতন

যেমন করে তুমি বাঁধলে বেণী।

চিঁড়েতনী

আচ্ছা, মনে কি তোমার আসছে, তোমার গানে আমি নেচেছিলুম কোনো একটা যুগে।

রুইতন

মনে আসছে, আসছে। এতদিন ভুলেছিলুম কী করে তাই ভাবি।

গান

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।
দোলা লাগে দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ঐ নাচের লহরীতে॥
যদি কাটে রসি, হাল পড়ে খসি,
যদি ঢেউ ওঠে উচ্ছ্বসি,
সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে
করিনে ভয় নেবই তারে নেবই তারে জিতে॥

দেখো চিঁড়েতনী, মন ছটফটিয়ে উঠেছে যমরাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে। আমি চোখের সামনে

দেখতে পাচ্চি ছবি, তুমি পরিয়ে দিলে আমার কপালে জয়তিলক, আমি বেরোলুম কাকে উদ্ধার করতে, বন্ধ দুর্গের দ্বারে বাজালুম আমার ভেরী। কানে আসছে বিদায়কালে যে গান গেয়েছিলে।

(নেপথ্যে)

গান

বিজয়মালা এনো আমার লাগি।
দীর্ঘরাত্রি রইব আমি জাগি॥
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকূলে
বুকের মধ্যে উঠবে আমার পরাণ দুলে,
সব যদি যায় হব তোমার সর্ব্বনাশের ভাগী॥

চিঁড়েতনী

চলো, চলো বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দু-জনে মিলে—দেখতে পাচ্চি যে সামনে—কী যেন কালো পাথরের ভ্রূকুটি, ভেঙে চুরমার করতে হবে। ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়ুক।

পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে! কী করতে এসেছি এখানে! ছিছি! কেন আছি! এ কী অর্থহীন দিন! কী প্রাণহীন রাত্রি! কী ব্যর্থতার আবৃত্তি মুহূর্তে মুহূর্তে!

রুইতন

সাহস আছে তোমার সুন্দরী?

চিঁড়েতনী

আছে আছে।

রুইতন

অজানাকে ভয় করবে না!

চিঁড়েতনী

না, করব না।

রুইতন

পা যাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, পথ ফুরোতে চাইবে না।

চিঁড়েতনী

কোন যুগে আমরা চলেছিলুম সেই দুর্গমে। রাত্রে ধরেছি মশাল তোমার সামনে। দিনে বয়েছি জয়ধ্বজা তোমার আগে আগে। আজ আর একবার উঠে দাঁড়াও। ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই সব নিরর্থকের আবর্জ্জনা।

রুইতন

ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ছক্কা পঞ্জার প্রবেশ)

ছক্কা

ওহে পঞ্জা। এ কী হোলো বলো দেখি!

পঞ্জা

ভারি লজ্জা হচ্চে নিজের দিকে তাকিয়ে। মূঢ় মূঢ়, কী করছিলি এতদিন!

ছক্কা

এতকাল পরে কেন মনে প্রশ্ন জাগছে এ সমস্তর অর্থ কী।

পঞ্জা

ঐ যে দহলা পণ্ডিত আসছেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা করি।

(দহলার প্রবেশ)

ছক্কা

এতকাল যে সব ওঠা পড়া শোওয়া বসা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম তার অর্থ কী!

দহলা

চুপ!

উভয়ে

করব না চুপ।

দহলা

ভয় নেই?

উভয়ে

নেই ভয় নেই ভয়! বলতে হবে অর্থ কী।

দহলা

অর্থ নেই,—নিয়ম!

ছক্কা

নিয়ম যদি নাই মানি!

দহলা

অধঃপাতে যাবে।

ছক্কা

যাব সেই অধঃপাতেই।

দহলা

কী করতে?

পঞ্জা

সেখানে যদি অগৌরব থাকে তার সঙ্গে লড়াই করতে।

দহলা

এ কেমন গোঁয়ারের কথা শান্তিপ্রিয় দেশে!

পঞ্জা

শান্তি ভঙ্গ করব পণ করেছি।

(হরতনী টেক্কার প্রবেশ)

দহলা

শুনছ শ্রীমতী হরতনী! এরা শান্তি ভাঙতে চায় আমাদের এই অতলস্পর্শ প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে।

হরতনী

আমাদের শান্তিটা বুড়োগাছের মতো, পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে, সেটা নির্জীব, তাকে কেটে ফেলাই চাই।

দহলা

ছি ছি, এমন কথা তোমার মুখে বেরোল! তুমি নারী, তোমরা রক্ষা করবে শান্তি, আমরা রক্ষা করব কৃষ্টি।

হরতনী

অনেকদিন তোমরা ভুলিয়েছ আমাদের

পণ্ডিত, আর নয়, তোমাদের শান্তিরসে হিম হয়ে গেছে আমাদের দেহ মন, আর ভুলিয়ো না।

দহলা

সর্ব্বনাশ! কার কাছ থেকে পেলে এ সব কথা ?

হরতনী

মনে মনে তাকেই তো ডাকছি। ঐ শুনতে পাচ্চ আমার গান আকাশে।

দহলা

সর্ব্বনাশ, আকাশে কথা নেমেছে, এবার ডুবল তাসের দেশ। পালাই, দৌড়ে পালাই! এখানে নিরাপদ নয়।

[দ্রুত প্রস্থান।

ছক্কা

সুন্দরী, তুমিই আমাদের পথ দেখাও।

পঞ্জা

অশান্তি মন্ত্র পেয়েছ তুমি—সেই মন্ত্র দাও আমাদের।

হরতনী

বিধাতার ধিক্কারের মধ্যে আছি আমরা, মূঢ়তার অপমানে।—চলো বেরিয়ে পড়ি।

ছক্কা

একটু নড়লেই যে ওরা দোষ ধরে। বলে অশুচি।

হরতনী

দোষ হয় হোক কিন্তু মরে থাকার মতো অশুচিতা নেই।

পঞ্জা

আজ বনের বাইরে কেউ নেই। তাই রাজার হুকুম, এই বটতলায় বসবে সভা। সেই সভায় আমরা বিদায় নেব।

[ছক্কা ও পঞ্জা উভয়ের প্রস্থান।

(রাজপুত্র ও সদাগরের প্রবেশ)

রাজপুত্র

গান

হে নিরুপমা,
　　গানে যদি লাগে বিহ্বল তান
　　　　করিয়ো ক্ষমা ॥
　　ঝর ঝর ধারা আজি উতরোল,
　　নদী কূলে কূলে উঠে কল্লোল,
　　বনে বনে গাহে মর্ম্মরস্বরে
　　　　নবীনপাতা।
　　সজল পবন দিশে দিশে তোলে
　　　　বাদলগাথা ॥
হে নিরুপমা,
　　চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
　　　　করিয়ো ক্ষমা ॥
　　তোমার দু-খানি কালো আঁখি-পরে
　　বরষার কালো ছায়াখানি পড়ে,

ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।
তোমারি চরণে নববরষার
বরণডালা॥

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে, তবে
করিয়ো ক্ষমা॥
এল বরষার সঘন দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত
কানন-'পরে।
নবকদম্ব মদিরগন্ধে
আকুল করে॥

(রাজাসাহেব প্রভৃতির প্রবেশ)

রাজাসাহেব

এ জায়গাটা কেমন ঠেকছে। ওটা কিসের গন্ধ?

রাজা

থাক্‌, আর প্রয়োজন নেই। এটা চতুর্থবর্গের পাঠ্যপুস্তকে চালিয়ে দিয়ো। তাসবংশীয় শিশুরা কণ্ঠস্থ করুক।

দহলা

উত্তম প্রস্তাব, উত্তম প্রস্তাব।

রাজা

তোমাদের প্রতি আমার আদেশ, চাঞ্চল্য দমন করো। (শাস্ত্রে আছে—

শান্ত যেই জন
যম তারে ঠেলে ঠেলে নেড়ে চেড়ে যায় ফেলে,
বলে মোর নাহি প্রয়োজন॥)

শোনো বিদেশী!

রাজপুত্র

আদেশ করো।

রাজাসাহেব

তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্চ। জলে

দিচ্চ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ,—এ সব কেন?

রাজপুত্র

রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলি উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্চ, গড়াচ্চ মাটিতে, সেই বা কেন?

রাজাসাহেব

সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র

এ আমাদের ইচ্ছে!

রাজা

ইচ্ছে! কী সর্ব্বনাশ! এই তাসের দেশে ইচ্ছে! বন্ধুগণ, তোমরা সবাই কী বলো!—

ছক্কা পঞ্জা

আমরা ওর কাছে ইচ্ছে মন্ত্র নিয়েছি।

রাজা

কী মন্ত্র!

ছক্কা পঞ্জা

গান

ইচ্ছে।

সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্চে নিচ্চে ॥
সেই তো আঘাত করছে তালায়,
সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়,
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে ॥

রাজা

যাও যাও এখান থেকে চলে যাও, শীঘ্র চলে যাও। (হরতনী! কানে পৌঁছল না কথাটা! চিঁড়েতনী, দেখছ ওর ব্যবহার!) হঠাৎ এমন হোলো কেন?

হরতনী

ইচ্ছে।

অন্য টেক্কারা

ইচ্ছে।

রাজা

সম্পাদক, তুমিও যে চুপ! তোমার হোলো কী?

সম্পাদক

আমারও দুই দুই সম্পাদকীয় স্তম্ভ ভেঙে পড়েছে।

রাজা

বাধ্যতামূলক আইন?

সম্পাদক

এ দেশে আর সে চলবে না।

সকলে

চলবে না। চলবে না।

রাজা

আমারও মনে হচ্ছে চলবে না।

("চলবে না চলবে না" বলতে বলতে সকলের গান)

গান

তুমি   কোন পথে যে এলে পথিক,
দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপনসম দেখা দিলে
বনেরি কিনারে॥
শ্রাবণে যে বান ডেকেছে
পূবের আকাশে,
পালে   লাগল জাগা এই বাতাসে
এলে জোয়ারে॥
কোন দেশে যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা,
কোন   গানের সুরের পারে, তাহার
পথের নাই নিশানা।
তোমার   সেই দেশেরি তরে
আমার   মন যে কেমন করে,
তোমার   মালার গন্ধে তারি আভাস
প্রাণে বিহারে॥

[সকলের প্রস্থান।